দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৭।১।৮৪

...৬৬. 230 পৃষ্ঠা... ৪ কলম... ৪

"নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান এবং বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী"—প্রসঙ্গে প্রস্তাব ও পরামর্শমূলক আরো আলোচনা আমরা প্রকাশ করতে চাই। —সম্পাদিকা

নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান এবং বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

ঊর্মি জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালের লোক গণনা অনুযায়ী ছিল ২০.২ শতাংশ। সম্ভবত এখন তা ২২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ হার মোটেও সন্তোষজনক নয়। এ ব্যাপারে সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা দরকার।

সরকার তথা শিক্ষা বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এর বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কিছু কথা থেকে যায়।

গত ১৩ই জানুয়ারী দৈনিক বাংলার মহিলা মহলে জনাবা রাবেয়া সিরাজ এ সম্পর্কে লিখেছেন। এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় পাসের ব্যাপারটি অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়ে আমি তাঁর সাথে একমত। তবে আমি তাঁর মত একেবারে এ ব্যবস্থার বিপক্ষে নই। তাছাড়া ভাতা ও সম্মানী দিয়ে শিক্ষক ছাত্রকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করাটা আমি সমর্থক করি না। অতীতের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা গেছে অর্থব্যয় করে এ ধরনের কাজে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

তিনি বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কথা ভাবছেন যারা গ্রেস নম্বরের সাহায্যে পাস করে। এ অবস্থাকে চলতে না দিয়ে এ অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। কেন শিক্ষারমান এত নেমে গেছে তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। সাধারণ মেধার ছাত্রছাত্রীদের ব্যয়ভার বহন করা কঠিন, অস্বীকার করছি না। কিন্তু কেন? এসব প্রশ্নের জবাব আগে পাওয়া দরকার। এ অবস্থাকে চলতে দেয়া যায় না। আমাদের চলতি শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন না করলে স্বাক্ষরতা অভিযান কেন, কোন উন্নয়ন কাজই সফল হবে না। কারণ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা।

জনাবা রাবেয়া সিরাজ কোন একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর করে তোলার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক ৫০ নম্বরকে ঐচ্ছিক বিষয় করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এটিকে গান, সেলাই বা রান্নার মত একটি বিষয় হিসাবে ধরে নিতে বলেছেন। আমার বক্তব্য তাহলে এই দুরূহ কাজটির দায়িত্ব খুব কম ছাত্রছাত্রীই নেবে। শুধুমাত্র নীতি বা আদর্শের তাড়নায় ছাড়া অন্য কেউ-ই এটি গ্রহণ করবে না।

নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর করে তোলা এবং তাকে পরীক্ষকদের সামনে উপস্থিত করার কাজটি ততটা সহজ নয়। গ্রামের চেয়ে শহরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজটি কঠিন। প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে মাথা পিছু একজন করে নিরক্ষর মানুষ খুঁজে পাওয়াটা বেশ অসুবিধাজনক। বিশেষ করে যারা হোস্টেলে থাকে তাদের জন্য এটি সত্যি দুষ্কর কাজ। কিন্তু যেহেতু এটি বাধ্যতামূলক, ফলে তারা যেন-তেনভাবে নিরক্ষর ব্যক্তি জোগাড়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির শিক্ষাদান তাদের দ্বারা হয় না, কেউ কেউ আবার আপন চেষ্টায় সাক্ষর কোন মানুষকে ধরে নিয়ে যায়।

আমি ইডেন কলেজের একজন ছাত্রীকে চিনি যে অতিকষ্টে একটি ছেলেকে কিছুটা সাক্ষর করে তুলেছিল, কিন্তু তার এক সতীর্থা সে ছেলেটিকে পরীক্ষকের সামনে নিয়ে হাজির করে। ফলে তাকে আবার মোটামুটি সাক্ষর ব্যক্তির খোঁজে লোক লাগাতে হয়েছে। কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পাস তাকে করতেই হবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জুয়েল বারীর কাছে শুনলাম, নিরক্ষর ব্যক্তির বয়ঃসীমা তাদের স্কুল থেকে নির্ধারিত করেছে বারো থেকে পঞ্চাশ। জানি না প্রত্যেক ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা এরকম নির্ধারিত আছে কিনা। তবে কতটুকু শিক্ষিত করতে হবে তার কোন সীমারেখা নেই বলে শুনেছি। ফলত ব্যাপারটি এমন দাঁড়াতে পারে যে, একজন সততার সাথে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষর করে তুলল, তবে নাম লেখানো ও বর্ণমালা পরিচিতি পর্যন্ত। আর একজন মোটামুটি সাক্ষর ব্যক্তিকে সংগ্রহ করল যে চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে অথবা সংবাদপত্রের শিরোনাম পড়তে পারে। এখন যে ছাত্র বা ছাত্রীটি সৎ, সে কি অপরজনের চাইতে কম নম্বর পাবে না? কে সত্যি সত্যি লেখা-পড়া শিখিয়েছে, কে শেখায়নি, তা ধরবার কোন ব্যবস্থা কি আছে?

নানা কারণে অনেকে এ ব্যবস্থা তুলে দেবার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। আমি তাঁদের সাথে একমত নই। আগেই বলেছি, এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। নিরক্ষরতা দূরীকরণে এ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু প্রয়োজন এ ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন। পরিকল্পকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, বর্তমানে এ ব্যবস্থাটি যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে সাফল্য আসার পথ ততটা সুগম নয়।

এ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞজনেরা অনেক ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন। এ সম্পর্কে আমারও সামান্য যা বক্তব্য তা এখানে বলছি।

আমার মনে হয় নিরক্ষর ব্যক্তি সংগ্রহের দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেয়া দরকার। ধরা যাক শহরের কোন বস্তিকে তাঁরা ঠিক করলেন যেখানে সপ্তাহে দু দিন কি তিন দিন ছাত্রছাত্রীরা গিয়ে ক্লাস নেবেন। এটা পালা করেও হতে পারে। তাহলে ঐ বস্তির নিরক্ষর মানুষ সপ্তাহের প্রতিদিনই শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। যিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন, তিনি এটি পর্যবেক্ষণ করবেন। কেউ ফাঁকি দিতে চাইলে সেটাও তাঁর পক্ষে ধরা সম্ভব হবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি, কতটুকু শিক্ষা দান করতে পেরেছেন অথবা এ কাজে কতখানি আন্তরিকতা ও একাগ্রতা প্রয়োগ তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাদের নম্বর দেবেন। যেমনটি দেয়া হয় টিউটোরিয়াল ক্লাসে। এটিকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হিসেবে ধরা যায়।

আবার এরকমও হতে পারে বাইরে না গিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই গণশিক্ষা স্কুল করা যায়। ছাত্রছাত্রীর অভাব হবে না বলেই মনে হয়। যদি স্কুলের সময়সূচী ভেবেচিন্তে রাখা হয়। কারণ এসব যান্ত্রিক শহরে এমন অনেক খেটে খাওয়া মানুষ আছে যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদেরও সাক্ষরতা অভিযানে অংশ নেয়া প্রয়োজন। তাদের জন্যও এটা বাধ্যতামূলক করা উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পকরা পরিকল্পনা পর্যালোচনার মাধ্যমে ঠিক করবেন কিভাবে এটা করা যায়।

যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজে গণশিক্ষা স্কুল করা সম্ভব হয়, তাহলে নিরক্ষরতা দূর হতে আর বেশী সময় লাগবে না। সেদিন দূরে থাকবে না, যেদিন কেরালা বা শ্রীলংকার মত বাংলাদেশের শিক্ষার হার হবে ৮৫ কি ৯০ শতাংশ। সত্যিকার উন্নয়ন সেদিনই সম্ভব হবে।